নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১২ পৃ : ৬৩-৭৫
© ২০০৭ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সম্পদ

মূল: বন্দনা শিবা

অনুবাদঃ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন*

'সম্পদ' বলতে আদতে জীবনকেই বোঝাতো। ইংরেজি 'resource' শব্দটির উৎস হচ্ছে লাতিন ক্রিয়াপদ *surgere*। মূল লাতিন ক্রিয়াপদটি ভূমি থেকে প্রতিনিয়ত উৎসারমান ঝর্ণাধারার প্রতিমূর্তিকে হাজির করতো। একটি ঝর্ণার মতোই সম্পদ নতুন করে করে জীবন পায়, এমনকি বার বার ব্যবহার বা ভোগ করার পরও – এই ছিল আদি ধারণাটি। আদি ধারণাটি এভাবে মহিমান্বিত করেছিল প্রকৃতির নিজকে পুনঃ পুনঃ উৎপাদিত করার ক্ষমতাকে এবং মনোযোগ কাড়তে চেয়েছিল প্রকৃতির সীমাহীন সৃজনশীলতার বিষয়ে। এছাড়া প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক সংক্রান্ত সনাতন এক ধারণার প্রকাশও এর মাঝ দিয়ে ঘটেছিল। ধারণাটি হলো - ধরিত্রী মানুষকে উপহার দেয় আর প্রতিদানে মানুষের উচিত এরূপই অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী হওয়া যাতে করে প্রকৃতির উদারতা শ্বাসরুদ্ধ না হয়ে যায়। আধুনিক সময়ের শুরুর দিকটায় 'সম্পদ' বলতে তাই পুনঃসৃজনের বিষয়টিকে যেমন বোঝাতো, তেমনি গুরুত্ব দেয়া হতো মানুষ ও সম্পদের মধ্যকার পারস্পরিকতার প্রতিও।

দান, কাঁচা মাল ও প্রতিকল্প

শিল্পবাদ এবং উপনিবেশবাদের আবির্ভাবের ফলে ধারণাগত বা প্রত্যয়গত এই যে অবস্থানটি সেটিতে ছেদ ঘটলো। 'প্রকৃতিক সম্পদ' বলতে বোঝানো হতে লাগলো প্রকৃতির সেসব বিষয়গুলোকে যেগুলো শিল্প উৎপাদন এবং ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের জন্য প্রাথমিক সম্ভরণ বা কাঁচামাল হিসেবে প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হলো। নতুন এই মানেটা সংজ্ঞা হিসেবে প্রথম উপস্থাপিত হয় ১৮৭০ সালে প্রকাশিত জন ইয়েটস্ এর 'বাণিজ্য-বেসাতির প্রাকৃতিক ইতিহাস' নামক গ্রন্থে। সেটি এরকম: 'কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে আমরা বুঝি খনির আকরিক, মাটির তলার পাথর আর অব্যবহৃত বা অ-আহরিত কাঠকে (ইত্যাদি)।' এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতিকে স্পষ্টতঃই

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২
ইমেইল : mailmnu@hotmail.com

তার সৃজনী ক্ষমতা থেকে বিযুক্ত করে দেখে। প্রকৃতি হয়ে যায় এমন কতগুলো অ-আহরিত বস্তু সামগ্রীর আধার, যেগুলো ক্রমশঃ আহরিত হবে পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হবার জন্য। এ বিবেচনায় সম্পদ মানে কেবল প্রকৃতির সেসব বস্তু বা অবস্থা, যেগুলো অর্থনৈতিকভাবে কাজে লাগতে পারে। পুনঃসৃজনের ক্ষমতার বিষয়টি এভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ভিত্তিহীন হয়ে যায় পারস্পরিকতা বা পারস্পরিক বিনিময়ের ধারণাটিও : এখন কেবল মানুষের উদ্ভাবনশীলতা এবং শিল্পের সংযোগেই প্রকৃতি মূল্য পেতে পারে, প্রকৃতি পরিণত হতে পারে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদে। কারণ প্রাকৃতিক সম্পদেরও উন্নয়ন প্রয়োজন, প্রয়োজন তার উৎকর্ষ সাধন। কেবল পুঁজি ও প্রযুক্তির সম্মিলনেই প্রকৃতি তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। তাহলে এ সময় থেকে এটা খুবই সাধারণ একটি ধারণার বিষয় হয়ে গেল যে, 'প্রাকৃতিক সম্পদগুলো নিজেরা নিজেদের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে না বা নিজ থেকে বিকশিত হতে পারে না এবং কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে কোন কিছু হয় না। মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগেই এগুলো থেকে সত্যিকারের কিছু একটা তৈরি করা সম্ভব; আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এজন্য প্রয়োজন খুব উঁচু দরের দক্ষতা।'

প্রকৃতি, যা আদতে পৌনঃপুণিক সৃজন, উৎপাদন বা সৃষ্টিশীলতায় বৈশিষ্ট্যময় বলে বিবেচিত হতো, সেটি এই পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে রূপান্তরিত হলো মৃত এবং উদ্দেশ্য-সাধনে-ব্যবহারযোগ্য বস্তুতে। নবায়িত হবার এবং বৃদ্ধি প্রাপ্তির যে সহজাত ক্ষমতা প্রকৃতির রয়েছে তা অস্বীকৃত হলো। প্রকৃতি নির্ভরশীল হয়ে পড়লো মানুষের উপর। প্রকৃতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন মানুষের উন্নয়ন। এটি আরও বিশেষভাবে সত্য হয়ে দাঁড়ালো উপনিবেশিত দেশগুলোর প্রকৃতির ক্ষেত্রে। শিল্পবাদ এবং উপনিবেশবাদ আসার আগে সমাজ ও প্রকৃতিতে যেটা ঘটেছে সেটা হলো বিবর্তন। ঔপনিবেশিক নীতির লক্ষ ছিল সাম্রাজ্যের জন্য পুঁজি ও কাঁচা মালের সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সে লক্ষে তারা মনোনিবেশ করলো একটি পরিকল্পিত উপায়ে প্রাকৃতিক সম্পদের 'উন্নয়নে'র দিকে, যাতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং পুঁজির প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়।

এটা মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে জন্ম দেয় নতুন এক দ্বৈতবাদের । যেহেতু প্রকৃতির 'উন্নয়ন' ঘটাবে মানুষ, সে কারণে তার নিজেকেও উন্নত হতে হবে - প্রকৃতির মাঝে নিবিড়ভাবে বিজড়িত হয়ে থাকবার মতো আদিম এবং পশ্চাৎপদ অবস্থা হতে 'উন্নতি' লাভ করতে হবে। প্রকৃতির প্রাকৃতিক সম্পদে রূপান্তরিত হওয়া এবং সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্রপূর্ণ মানুষের 'দক্ষ মানব সম্পদে' পরিণত হওয়া - এ দুটি পরিবর্তন একই সাথে, হাতে হাত ধরে সংঘটিত হওয়া জরুরী হয়ে পড়ল। উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক জাতিসংঘ প্রতিবেদনে যেমন বলা হয়েছে, 'প্রাকৃতিক

সম্পদের উন্নয়নের পাশাপাশি অবশ্যই মানব সম্পদের উন্নয়নও ঘটাতে হবে।' এভাবে দেখা যচ্ছে, প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন এবং ঐ সম্পদকে বাণিজ্যিক ব্যবহারের কাজে লাগানোর পুরো বিষয়টার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো শ্বেতাঙ্গ মানুষের 'সভ্যতা'র দায়। মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্কটাই বদলে গেল। পুরোনো সম্পর্কটা ছিল দায়িত্বশীলতা, সহিষ্ণুতা এবং পারস্পরিকতার এবং নতুন সম্পর্কটা দাঁড়াল বল্গাহীন আহরণ আর শোষণের।

উপনিবেশগুলোতে সবক্ষেত্রেই প্রকৃতির শোষণ দুই পর্যায়ে হয়েছে বলে দেখা যায়। প্রথম পর্যায়ে প্রকৃতির সম্পদকে ধরে নেয়া হয়েছিল অঢেল বলে এবং মনে করা হয়েছিল এগুলো অবাধে, ইচ্ছে মতো পাওয়া যেতে পারে। 'সম্পদ' শোষণ করা হলো দ্বিধাহীন লোলুপতায়। পরিমিত ব্যবহারের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এরূপ আহরণ-শোষণে যখন অবস্থার অবনতি ঘটে এবং দুষ্প্রাপ্যতা বা অপ্রতুলতার সমস্যা দেখা দেয় তখন, দ্বিতীয় পর্যায়ে, বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য কাঁচা মালের অবাধ সরবরাহ বজায় রাখার প্রয়োজনে 'প্রাকৃতিক সম্পদের' 'ব্যবস্থাপনা' গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে শুরু করলো। অর্থাৎ প্রথমে সম্পদে রূপান্তরিত হলো ভূমি আর পরে সম্পদ হলো বন ও পানি। এখন প্রযুক্তির অগ্রগতির অনুষঙ্গে বীজ-এর পালা এসেছে 'জীনগত সম্পদ'-এ রূপান্তরিত হবার।

তাহলে 'প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা' হলো নিয়ন্ত্রণহীনভাবে প্রকৃতি ধ্বংসের ফলে সৃষ্ট সম্পদের অপ্রতুলতা থেকে উৎসারিত এক ধরনের ব্যবস্থাপনাগত ফাঁপর।

যুদ্ধোত্তর ও উপনিবেশোত্তর প্রথম কয়েক দশক সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়ে এক ধরণের নীরবতা লক্ষ করা যায়। প্রকৃতি যেন বিস্মরণে তলিয়ে গেল। যুদ্ধোত্তর এ সময়টিতে ছিল প্রযুক্তিবিদ্যার এক মহারমরমা। সম্ভবতঃ মনে করা হয়েছিল প্রযুক্তিবিদ্যা তার যাদুকরী ক্ষমতার বলে এমন এক সীমাহীন প্রাচুর্যের অলৌকিক দ্বার উন্মোচন করে দেবে যাতে অপ্রতুল বা দুষ্প্রাপ্য বস্তুসামগ্রীর অনেক অনেক প্রতিকল্প পেয়ে যাওয়া যাবে। রেশম, পশম এবং তুলার প্রতিকল্প হিসেবে এলো সিনথেটিক ফাইবার, জৈবিক সারের জায়গায় এলো রাসায়নিক সার; এবং মনে করা হলো ভূমি ও তার উৎপাদনের সীমাবদ্ধতার আওতা থেকে বেরিয়ে সীমাহীন প্রতিকল্পের অঢেল সঞ্চয়ের সন্ধান বুঝি সমাজ পেয়ে গেছে।

যুদ্ধোত্তর পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায় উত্তরে আরও যেটা ঘটলো তা হলো, এখানকার (উত্তরের) উদ্বৃত্ত পুঁজি তৃতীয় বিশ্বে বিনিয়োগ আবশ্যক হয়ে পড়লো। পরবর্তী 'উন্নয়ন দশক'সমূহে দেখা গেল তৃতীয় বিশ্বের সমাজসমূহ এবং তাদের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য এক বিরাট রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাঝ দিয়ে গেল, যে রূপান্তরের সব থেকে

প্রভাবশালী কারণ হিসেবে আবির্ভূত হলো এই উন্নয়নই । অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে উন্নয়নকে সমার্থক করে ফেলা হয়। মনে করা হলো উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত উপকরণগুলোর সরবরাহ অসীম; সীমাবদ্ধতা কেবল পুঁজি এবং প্রযুক্তিবিদ্যার। তাই পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রথম বছরগুলোতে প্রধান সংগঠক শক্তি হিসেবে দেখা দেয় উন্নয়ন সহায়তা (aid) এবং প্রযুক্তিগত স্থানান্তর (technological transfer)। পুঁজি ও প্রযুক্তিবিদ্যার একটা রমরমা অবস্থা গেল এই সময়। *** । মনে করা হলো প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলে অপ্রতুলতা বা অভাবের অবসান হবে এবং অবসান হবে টিকে থাকার সংগ্রামেরও।

যা হোক, ১৯৭০ পরবর্তী সময়ে তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে অ-নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের এক নতুন ধরণের অপ্রতুলতার ধারনা উপলব্দ হলো। 'প্রবৃদ্ধির সীমাবদ্ধাতা' বিষয়ক বিতর্কে যেসব যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত হয় তাতে উন্নয়ন ডিসকোর্সে প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত উদ্বেগটা ফিরে এলো। কিন্তু যেহেতু বিতর্কটা ছিল কেবলই কথিত নিঃশেষযোগ্য এবং নবায়নযোগ্য সম্পদকে আলাদকরণ বিষয়ে এবং যেহেতু অধিক পরিমাণে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল অ-নবায়নযোগ্য সম্পদের বিষয়ে, সে কারণে অর্থনীতিবিদরা খুব শীঘ্রই প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতার এই আলোচনাটিকে 'সাসটেইনিবিলিটি' সংক্রান্ত আলোচনায় পরিবর্তন করে নিতে পারলেন। 'এমনকি যদি আমাদের কিছু সম্পদ শেষও হয়ে যায়, তাহলে কি আমরা অন্যগুলোকে তার প্রতিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না ?'- তারা প্রশ্ন করলেন। তারা ঘোষণা করলেন, 'কয়লার মতো যেসব কিছুর মজুদ এখন আংশিকভাবে শেষ হয়ে গেছে সেগুলোর ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগই হচ্ছে একটি যথাযথ/ভালো প্রতিকল্প।' 'এখন যে চড়া দরের ভোগবাদ চলছে সেটি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব যদি সীমাবদ্ধ সমধর্মী সম্পদসমূহের মজুদ যতটুকু নিঃশেষিত হয়েছে তার মূল্যের সমান পরিমাণের বিনিয়োগের এখন করা সম্ভব হয়।'

অপ্রতুলতা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের হিশেব-নিকেশ আর বিতর্কে প্রকৃতির জীবন প্রক্রিয়ার বিষয়টি পুরোপুরি সরে গিয়ে সেখানে এলো অর্থ আর বিনিয়োগের প্রসঙ্গ। টাকাকে কখনো অস্তিত্বগতভাবে জীবনে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয় – এটি এক প্রাচীন প্রজ্ঞা। সত্যটি এক নেটিভ আমেরিকান প্রবাদের মাঝ দিয়েও উঠে এসেছে, 'যখন তুমি শেষ গাছটি উপড়ে ফেলবে, শেষ মাছটি ধরবে এবং দূষিত করে ফেলবে শেষ নদীটি তখনই কেবল তুমি বুঝতে পারবে যে টাকা গিলে খাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।' এই পর্যায়ে এসে এসব প্রজ্ঞা বা বোধ-বিবেচনার কোন মূল্যই আর থাকলো না।

বাজারকেই ধর্মশাস্ত্র হিসেবে জ্ঞান করা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার জোরে অসম্ভব সাধন সম্ভব বলে মনে করার কারণেই রবার্ট সোলো-র মতো অর্থনীতিবিদরা বলতে পারেনঃ 'প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার বিষয়ে প্রাচীন যে উদ্বেগ সেটির শক্ত কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে বলে এখন আর দেখা যায় না।' সোলো এমনকি অর্থশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন এরূপ বক্তব্যের জন্য যে, উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষিত হয়ে যাবার ধারণাকে পুরোপুরি দূর করে দিতে পারে এবং সম্পদের ফুরিয়ে যাওয়াটা আসলে কোন সমস্যাই নয়। তিনি বলেছেন,

> যদি প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে অন্য উপকরণ দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দেয়া যায়, তাহলে নীতিগতভাবে সেখানে কোনরূপ সমস্যা থাকে না। কার্যত দুনিয়াটা প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াই চলতে পারে। সুতরাং ফুরিয়ে যাওয়া বা নিঃশেষিত হওয়া একটা ঘটনা মাত্র, কোনো মহাদুর্যোগ নয়।

১৯৭০ এর দশকে শুরু হওয়া অপ্রতুলতার মহা বিতর্ক এভাবে থিতিয়ে আসে, বলা যায়, অপ্রতুলতার সমস্যা প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় সমাধান হবে - এই প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে। যা হোক, এই উচ্চাশা প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই উবে যায়। পরবর্তী দশকে এসে বোঝা গেল উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং সম্পদ ভোগ ও ধ্বংসের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার যে প্রতিরোধহীন ক্ষিধা তা কেবল অ-নবায়নযোগ্য সম্পদের মজুদকেই নিঃশেষ করছে না, বরং নবায়নযোগ্য সম্পদগুলোও প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে ক্রমশঃ অ-নবায়নযোগ্য হয়ে উঠছে। ফলে এ সময়ে এসে অপ্রতুলতার ডিসকোর্সের 'প্রতিবেশকরণ' ('ecologizing') ঘটে। বনগুলোর, আবহমণ্ডলের, সমুদ্রের, মৃত্তিকার এবং নদীর যে আত্ম-পুনঃসৃজনের ক্ষমতা তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রযুক্তিগত প্রবৃদ্ধির জোরে প্রকৃতির সীমাবদ্ধতাকে সরিয়ে দেবার যে চেষ্টা গত ৪০ বছরের উন্নয়ন জামানায় হয়েছে তা প্রতিবেশগত বিপর্যয় রূপে অধঃক্ষিপ্ত হলো। প্রকৃতির সীমানাকে তছনছ করে দেবার ফলশ্রুতিতেই সদা-পরিবর্তশীল উন্নয়ন দিকনির্দেশনার সর্ব-সম্প্রতিক পর্যায়ে সামনে এসেছে 'টেকসই উন্নয়ন' আর 'টেকসই প্রবৃদ্ধি'র মতো ধারণাগুলো। প্রকৃতির কার্য-প্রক্রিয়ার ওপর এখন *চাপিয়ে* দেয়া হবে নতুন সীমারেখা যাতে করে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি টেকসই হয়।

সম্পদ শব্দটির এই যে ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতনা সেটি আসলে প্রকৃতি সম্পর্কে মনোভাবের পরিবর্তনশীলতাকেই প্রকাশ করে।

সাধারন সম্পদ (commons) এর বিনাশ

প্রকৃতিকে পবিত্র হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটা যেমন বিনষ্ট হয়েছে তেমনি পাশাপাশি প্রকৃতিকে সাধারণের সম্পদ হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তথা প্রকৃতি যে সবার জন্য

উন্মুক্ত এবং প্রকৃতির প্রতি যে সবার দায়দায়িত্ব রয়েছে তা মনে করার যে দৃষ্টিভঙ্গি তারও বিনাশ ঘটেছে। প্রাকৃতিক সম্পদকে শিল্প কাঁচা মালের যোগান হিসেবে একটা পাকাপাকি রূপ দেয়ার জন্য সাধারণ সম্পদের ধারণার এরূপ বিনাশ জরুরী ছিল। যা জীবন ধারণের ভিত্তিমূল, তাকে সবার ভাগাভাগি করে নেয়া প্রয়োজন – তাকে ব্যক্তিগত মালিকানায় ছেড়ে দেয়া যায় না বা তাকে কারও ব্যক্তিগত লাভের জন্য কাজে লাগাতে দেয়া যায় না। ফলে সাধারণের সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করতে হলো এবং মানুষের টিকে থাকার/জীবিকার ভিত্তিমূলগুলোকে শিল্পবিকাশ ও পুঁজি সঞ্চয়ের যন্ত্রের বাগে আনা হলো।

সাধারণ সম্পত্তি, যেগুলোকে ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্রের ভাষায় বলা হতো পোড়োজমি (wastelands) আসলে তা পোড়ো ছিল না। এসব জমি ছিল উৎপাদনশীল। এগুলো প্রতিষ্ঠিত কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য যোগান দিত বিস্তৃত পশুচারণভূমি, যোগান দিত নির্মাণ কাজে কাঠ ও পাথর, খড় ও ঝুড়ির জন্য নলখাগড়া, জ্বালানীর জন্য কাঠ, খাবারের জন্য বাদাম ও ফল-ফলারি এবং বুনো জন্তু, মাছ আর পাখ-পাখালি। বিরাট সংখ্যক সাধারণ কৃষকও জীবন ধারণ করতে পারত জীবন যাপনের এসব সাধারণ অধিকারের বলে। শস্য-উৎপাদনকারী জেলাসমূহের অতি জনাকীর্ণ গ্রামগুলো থেকে অভিগমন করে আসতে বাধ্য হতো যেসব দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকরা তারা আশ্রয় পেতো এই জমিগুলোতেই।

কিন্তু একই সময় এই সাধারণের সম্পত্তির প্রতি সপ্তদশ শতকের ভূস্বামীর লোভাতুর দৃষ্টিও ছিল। খনিজ সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনার লোভ তো ছিলই, আরও ছিল অনুন্মোচিত সম্পত্তির আধারকে নিজের জমিদারীর মধ্যে পাওয়ার অভিলাষ। গাছ কেটে সাফ করে, জলাভূমির পানি শুকিয়ে, অনুর্বর জমিতে সার দিয়ে জমিগুলোর উন্নতি করা সম্ভব এবং এভাবে উন্নীত জমিগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক দরে কোন খামারের কাছে লীজ দিয়ে তালুকের ভূ-স্বামী অনেক নতুন সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে পারেন। এতে কেবল ভূ-স্বামীরই লাভ হয় না, লাভ হয় 'নতুন' জমি যারা লীজ নিতে পারে তাদেরও। কিন্তু এসবই পাওয়া যাবে ভূমিহীন কৃষককে পুরোপুরি জলাঞ্জলি দিয়ে, মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকের স্বার্থহানির বিনিময়ে। চারণভূমি এবং জমি ব্যবহারের সাধারণ অধিকার হারিয়ে তাদের আরও নিঃস্ব হয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কায়িক শ্রমিক এবং শিল্প শ্রমিক বা কুড়ে ঘর তৈরি করে জীবিকা-নির্বাহকারী, যারা কিনা কেবল শ্রম বা সামান্য খয়রাতের ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে এই সাধারণ সম্পদের ওপরও নির্ভর করতো, তাদের জীবনও এতে বিপন্ন হয়। সুতরাং সাধারণ সম্পত্তি এবং পতিত জমিতে নিজ নিজ অধিকার এবং ভাগ নিয়ে তালুকের ভূ-স্বামী এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কৃষক শ্রেণীর মধ্যে দেশের বহু জায়গায়

মুখোমুখি বিরোধ দেখা দেয়। এই জমিগুলো কারা নিয়ন্ত্রণ করবে – ভূ-স্বামী আর বৃহৎ খামার মালিকরা নাকি সাধারণ কৃষক জনগণ–এই ছিল সংঘাতের মূল বিষয়। ১৬৩০ ও ১৬৪০ দশক-কালে এবং ইংরেজ বিপ্লবের সময়ে এটিই ছিল মূল ভূমি-ইস্যু।

এই এনক্লোজার মুভমেন্ট হচ্ছে সেই সন্ধিক্ষণ যেটি মানুষের সাথে প্রকৃতির এবং মানুষের সাথে মানুষের – এই উভয় প্রকার সম্পর্ককেই পাল্টে দিল। সাধারণ সম্পত্তি সকলে মিলে ব্যবহার প্রথার জায়গায় চালু হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির আইন। মজার বিষয় হলো 'প্রাইভেট' ('private') শব্দটির ল্যাটিন মূল অর্থই হচ্ছে 'বঞ্চিত করা' ('to deprive')।

পশুচারণভূমির ক্ষেত্রে যা ঘটে ঠিক একই ঘটনা ঘটে বনভূমির ক্ষেত্রেও। বনের মালিক ছিল রাজা বা রাণী আর কিছু কিছু বনজ উৎপাদনে সাধারণ কৃষকদের ছিল প্রথাগত অধিকার। কিন্তু পুঁজিবাদের সম্পদের চাহিদা বাড়লে রাজা গ্রহণ করলেন বন-বিনাশের (deforestation) নীতি। কৃষক তার অধিকার হারালো; রাজশক্তি আর তালুকের লর্ডরা বিনাশকৃত বনের জমিগুলো নিজেদের সীমানাভূক্ত করে এবং তুলনামূলক কম মূল্যে সেগুলো লীজ দিয়ে দেয় বৃহৎ খামার মালিকদের কাছে। এই বন বিনাশ নীতি এবং সাধারণের অধিকারের বনভূমিকে ব্যক্তিমালিকানার সীমানায় সীমাবদ্ধ করে নেয়ার ঘটনাই (এনক্লোজার) 'সম্ভবত গৃহযুদ্ধ শুরুর পূর্বে ৩৫ বছরের মধ্যে সব থেকে বৃহত্তম একক জন-অসন্তুষ্টির জন্ম দেয়।' ১৬২৮ থেকে ১৬৩১ সালের মধ্যে বড় বড় দলবদ্ধ জনতা এসব এনক্লোজার আক্রমণ করে এবং এসবের সীমানা ভেঙ্গে ফেলে, পুরো ইংল্যান্ড জুড়ে কার্যত বিদ্রোহাবস্থার তৈরি হয়।

এই যে ইংল্যান্ডে বন বিনাশ এবং বনকে ব্যক্তিগত মালিকানায় নিয়ে যাওয়ার ঘটনা (এনক্লোজার) – এরই পুনরাবৃত্তি হয় পরবর্তীতে উপনিবেশগুলোতে। ভারতে ১৮৬৫ সালে প্রথম ভারতীয় বন আইন পাশ করি সুপ্রিম লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, যে আইনের বলে বনভূমি আর পোড়োজমিকে (অপরিমাপকৃত জমি) সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষমতা পায় সরকার। আজকের দিনে যাকে বলা হয় বনভূমির 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা' তার যাত্রা শুরু হয় এই কানুন প্রণয়নের মাঝ দিয়েই। বনভূমি এবং বন-উৎপাদে স্থানীয় লোকদের অধিকার– এ দুটি বিষয়ের অবক্ষয়ই আসলে এর মাঝ দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা পায়।

প্রকৃতির সীমানা লঙ্ঘন

প্রকৃতি হচ্ছে একটি সম্পদ এবং এই সম্পদ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হলেই কেবল এটি মূল্য লাভ করে – এটি হলো উন্নয়ন প্রকল্পের মূল বিষয়। এবং

এটিই উন্নয়ন সঙ্কটেরও কেন্দ্রীয় বিষয়। দার্শনিকভাবে, প্রকৃতির অ-পুতকরণের মাঝ দিয়েই প্রকৃতির অখণ্ডতা ও শুদ্ধতরা লজ্ঘন অনেকটা অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রকৃতির শুদ্ধতা ও অখণ্ডতা লজ্ঘিত হয় প্রকৃতির সীমারেখা অমান্য করার মধ্য দিয়ে। প্রকৃতির এই সীমানা বজায় রাখা জরুরী ছিল প্রকৃতির নিজের জীবনের যে পুনরুজ্জীবিত হবার এবং নবায়িত হবার ক্ষমতা তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য। বাস্তুসংস্থানবাদী একটি সংস্কৃতির সাথে পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতাধারী প্রকৃতির যে সম্পর্কমালা সেখানে প্রকৃতির এই সীমাবদ্ধতা অলজ্ঘনীয় বলে বিবেচিত হয় এবং মানুষের কার্যক্রমও হয় সে অনুযায়ী সহিষ্ণু ও নিয়ন্ত্রিত। এ সম্পর্কসূত্র প্রাথমিকভাবে নৈতিক।

উল্লিখিত সম্পর্কের একদমই বিপরীত সম্পর্ক হচ্ছে শিল্পায়িত সমাজে সংস্কৃতি এবং 'প্রাকৃতিক সম্পদ'-এর মধ্যকার সম্পর্ক। এখানে সীমাবদ্ধতাগুলোকে দেখা হয় নিছকই কতক প্রতিবন্ধক হিসেবে, যেগুলো সরিয়ে দেয়া জরুরী। প্রকৃতির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব নৈতিক বিবেচনার বিষয়টি এখানে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সম্পর্কটি কেবলই একটি বাণিজ্যিক ভাবনার বিষয়ে রূপ পায়। এখন পর্যন্ত প্রকৃতিগত অবস্থার ওপর বেকনীয় ভাব-ভাবনার এই যে বিজয় এটিই প্রকৃতির পুরুজ্জীবন লাভের ক্ষমতা বৈকল্যগ্রস্ত হয়ে পড়ার কারণ। প্রকৃতির নতুন জীবন লাভের ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণে এবং 'পুনরুত্থিত হবার' সামর্থ্য ব্যহত হওয়ায় দেখা দেয় প্রকৃত অপ্রতুলতা বা দুষ্প্রাপ্যতা – বনভূমি উজাড় হয়ে যায়, নদীগুলো যায় শুকিয়ে, মাটি হারায় তার উর্বরতা এবং দূষিত হয় পানি, মাটি আর বাতাস। 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ' নামে যেসকল পরিবেশগত সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয় তার অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির কাজ নয় বরং বিজ্ঞানী ও পরিকল্পনাকারীরা সীমাহীন প্রবৃদ্ধি আর সীমহীন ভোগের প্রয়োজনে যেভাবে সব সীমা-পরিসীমা পদদলিত করে গেছেন তারই ফলশ্রুতি।

যা হোক, সীমাহীন প্রবৃদ্ধির এ আস্ফালন বাস্তবে সত্য হয়নি, কারণ টেকসই হবার যে শর্ত তা-ই মানা হয়নি। উন্নয়ন প্রক্রিয়া নিজেই এখন নতুন সীমাবদ্ধতার মুখে এবং তারও চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো টিকে থাকা, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের টিকে থাকাই এখন হুমকির মুখে। নতুন দারিদ্র্য তৈরি হয়েছে এবং দারিদ্র্যের এই ক্রমবর্ধমান অবস্থাই উন্নয়নের সঙ্কটকে স্পষ্ট করে তোলে। এই নতুন দারিদ্র্যকে দেখতে হলে প্রথমে সনাক্ত করতে পারতে হবে যে, উৎপাদনশীলতা ও প্রবৃদ্ধির যে ক্যাটিগরিগুলোকে ইতিবাচক, প্রগতিশীল আর বিশ্বজনীন মনে করা হতো বাস্তবে সেগুলো রাজনৈতিকভাবে, স্থানিকভাবে এবং বৈষয়িকভাবে সীমাবদ্ধ চারিত্র্যের। প্রকৃতির উৎপাদনশীলতা ও প্রবৃদ্ধি এবং মানুষের জীবিকা উৎপাদনের দৃষ্টিকোন

থেকে এগুলো প্রতিবেশগতভাবে ধ্বংসাত্মক; শ্রেণীগত, সাংস্কৃতিক এবং লিঙ্গীয় অসমতার মূলে রয়েছে এগুলোই।

এটা কোন দুর্ঘটনা নয় যে বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হওয়া আধুনিক, দক্ষ এবং উৎপাদনশীল প্রযুক্তিবিদ্যার সাথে প্রতিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির একটা সরাসরি যোগাযোগ আছে। এসব প্রযুক্তিবিদ্যা যেভাবে সম্পদ-কেন্দ্রিক এবং শক্তি-কেন্দ্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেয় তাতে প্রতিবেশগত ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ সরে আসাই জরুরী হয়ে পড়ে। এই সরে আসার ফলে অপরিহার্য প্রতিবেশগত প্রক্রিয়া বিপন্ন হয়, নবায়িত হবার ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যবস্থাগুলো পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় অ-নবায়নযোগ্য 'সম্পদে'। উদাহরণস্বরূপ, একটি বনভুমির বৈচিত্র্য যদি রক্ষা করা হয় এবং বিচিত্র ধরণের প্রয়োজন পূরণে তাকে ব্যবহার করা হয় তাহলে, সেটি বিভিন্ন ধরণের জৈবসম্পদের (biomass in different forms) চাহিদা সুদীর্ঘকাল ধরে পূরণের জন্য অনিঃশেষযোগ্য যোগান নিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠের নিয়ন্ত্রণহীন এবং ব্যপক চাহিদা যদি কোন বনভূমির ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে প্রাকৃতিক গাছ-গাছালির বিরামহীন নিধন চলতে থাকে। এর ফলে বনভূমির প্রতিবেশগতভাবে পুনরুজ্জীবন লাভের ক্ষমতার বিনাশ ঘটে, শেষবধি নবায়নযোগ্য বনভূমি পরিণত হয় অ-নবায়নযোগ্য সম্পদে। পানি, খড়-বিচালি, জ্বালানি আর খাদ্যের নতুন ধরণের অপ্রতুলতার সমস্যা তৈরি হয় এভাবে।

প্রকৃতির স্বভাবগত পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতা কোন একটি নির্দিষ্ট সম্পদের অতি-আহরণের কারণেই কেবল বৈকল্যগ্রস্ত হয় না। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সম্পদের যে ক্ষতি প্রতিবেশগত প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবে হয়ে থাকে তার কারণেও অনেক সময় প্রকৃতির এ ক্ষমতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। নদী ও জলপ্রবাহ সংলগ্ন এলাকায় অতি বৃক্ষ নিধনের কারণে কেবল বনভূমিই বিনষ্ট হয় না বরং জলবিদ্যাগত অস্থিরতা তৈরি হয়, নবায়নযোগ্য পানি সরবরাহ বিনষ্ট হয়।

এরকমের সম্পদঘণ (resource intensive) শিল্পকারখানা অপরিহার্য প্রতিবেশগত প্রক্রিয়াকে কাঁচামালের মাত্রাহীন চাহিদার দ্বারা যেমন বিপন্ন করে তেমনি এর থেকে সৃজিত মাত্রাতিরিক্ত বর্জ্য দূষিত করে বায়ু, পানি ও মৃত্তিকাকে। বিলাসী ভোগবাদের প্রয়োজনে কাঁচা মালের যে চাহিদা তা থেকেও প্রায় সময় এটা হয়ে থাকে।

মারাত্মক প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের পরও প্রকৃতিকে সম্পদ হিসেবে দেখার আধিপত্যশীল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয় রয়েছে। উত্তরের জন্য এবং দক্ষিণের

অভিজাত শ্রেণীর মানুষের জন্য বিনাশটা এখনও পর্যন্ত বহুলাংশে সংগুপ্ত অবস্থায়; প্রকৃতির সাধারণ সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার সুবাদে এবং নিজেদের বিত্ত বৈভবের কল্যাণে তারা যে প্রাচুর্যের দেয়াল নিজেদের চারপাশে গড়ে তুলেছে তা তাদেরকে নিঃস্ব পরিবেশ আর হত-দরিদ্র মানুষদের থেকে গা বাঁচিয়ে দূরে থাকতে সাহায্য করছে। অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার বিনিময়ে যে প্রতিবেশগত মূল্য দিতে হয় তা এর ফলে বহুলাংশেই তাদের কাছে অদৃশ্য থেকে যায়।

বিজ্ঞান ও শিল্প বিপ্লব ঘটে যাবার পর প্রযুক্তিবিদ্যা এবং অর্থশাস্ত্র যুগপৎভাবে এ ধারণাই বলবৎ করেছে যে প্রাচুর্য সৃষ্টির জন্য প্রকৃতির সীমাবদ্ধতাকে অবশ্যই লঙ্ঘন/অগ্রাহ্য করতে হবে। যা হোক, এই সীমানা লঙ্ঘন যে কিভাবে প্রতিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলেছে/বিপন্ন করেছে তার সুস্পষ্ট নজির হলো কৃষি। শত শত বছর ধরে কৃষি ভিত্তিক সমাজগুলো প্রকৃতির সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় রেখে কাজ করেছে এবং এর ফলে গাছ-পালার জীবন ও মৃত্তিকার উর্বরতা নবায়িত হবার, নিজস্ব স্বাভাবিক ক্ষমতা বলে পুনরুজ্জীবিত হবার, নতুন জীবন লাভের সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু গাছ-পালা ও মাটির উর্বরতার নব জীবন লাভের প্রকৃতিক প্রক্রিয়াকে আধুনিক পশ্চিমা মানুষেরা একটি প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচনা করে একে অপসারণ করা জরুরী বলে মনে করল। প্রকৃতির উর্বরতা আর বীজের জায়গায় শিল্পোৎপাদিত সার এবং বৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি করা বীজ প্রজাতিকে উন্নততর বিকল্প বলে মনে করা হলো। এসব উদ্ভাবন এমনকি মাটির নবায়নযোগ্য উর্বরতা এবং নবায়নযোগ্য প্রাণী জীবনকেও অ-নবায়নযোগ্য সম্পদে পরিণত করে। সবুজ বিপ্লব এবং শিল্পায়িত কৃষির জন্য কাঁচা মাল এবং সম্ভরণ (input) হিসেবে মাটি ও বীজকে ব্যবহার করা হয়। ফল হয়েছে জলমগ্ন ও লবণাক্ত পতিত জমি আর কীটপতঙ্গ ও রোগ-উপদৃষ্ট (দৃষ্ট/ উপদ্রুত/ উপদৃষ্ট) শস্য।

প্রকৃতিকে পাল্টে ফেলে সম্পদে পরিণত করার সর্বশেষ ধাপ হলো বীজকে রূপান্তরিত করে 'জীনগত সম্পদ' বানানো। যে বীজ থেকে জৈব-জীবন/ গাছ-গাছালির জীবন (plant life) পুনঃ জীবন লাভ করতো সেটি এর ফলে পরিণত হলো কর্পোরেট মুনাফা যোগান দেয়া জীন-কৌশলগত, পেটেন্ডকৃত এবং মালিকানায় অধিকৃত এক পণ্যে। উদ্ভিজ্জকে নতুনভাবে জীবন দানের প্রাকৃতিক যে প্রক্রিয়া তা এখন আদিম এবং শ্লথ বলে বিবেচিত। প্রজাতিসমূহের মধ্যকার অন্তরায়/প্রতিবন্ধক (প্রজাতি প্রতিবন্ধক) তৈরির মাধ্যমে জীবন পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রকৃতি যে সীমানা বেঁধে দিয়েছিল, যান্ত্রিক উপায়ে (transgenetic life-forms) তৈরির মাধ্যমে সে সীমানা এখন লঙ্ঘন করা হবে। জৈবমণ্ডলে এবং জীবনে এর প্রভাব যে কী হবে তা জানা যায় না, এমনকি কল্পনাও করা যায় না।

প্রত্যাশিত ছিল বিজ্ঞান বিপ্লব অজ্ঞতার সীমানা পেরুবে । সেটা না করে একটি নির্দিষ্ট জ্ঞান-ধারা – যেটি কিনা প্রকৃতিকে কেবল সম্পদ হিসেবে দেখে এবং প্রকৃতির সীমাবদ্ধতাকে দেখে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে – অভূতপূর্ব মানব-সৃষ্ট অজ্ঞতার জন্ম দিল। এ অজ্ঞতা এ গ্রহের প্রাণিকূলে জন্য ক্রমশঃ হুমকির এক নতুন উৎস হয়ে উঠছে।

জীবিকার গুরুত্বহানি

প্রকৃতিকে একটি সম্পদে বদলে ফেলার এই প্রক্রিয়ার সাথে সাথে এটাও ঘটে যে জীবন-জীবিকার উৎস হিসেবে প্রকৃতিতে মানুষের যে প্রাচীন অধিকার তাকেও পর করে দেয়া হলো। বন, পানি, ভূমি এবং উদ্ভিজ্জকে শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের উদ্দেশ্যে যখন 'উন্নত' করা হয় বা 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা'র আওতায় আনা হয় তখন সেগুলোকে আসলে আত্মসাৎ করে নেয়া হয় ঐসব সম্প্রদায় থেকে, যারা শত শত বছর ধরে জীবন-জীবিকার জন্য এসবের উপর নির্ভর করে এসেছে।

নিজেদের দাবি, সম্পদ এবং জ্ঞান থেকে প্রাকৃত মানুষদের এরূপ অধিকাচ্যুতি কখনো যে চ্যালেঞ্জ হয়নি তা নয়। শিল্প বাণিজ্যের কাঠ যোগাবার জন্য সাধারণ মানুষের বনভূমি ঔপনিবেশিকরণ করা হবে – এর বিরুদ্ধে গত দু'দশক জুড়ে পৃথিবীর দেশে দেশে আন্দোলন-সংগ্রাম চলছে।

ভারতে বনভূমির প্রতি মানুষের অভিগম্যতা এবং অধিকার প্রথম মারাত্মকভাবে সংকুচিত করা হয় ১৮৭৮ ও ১৯২৭ সালের বন আইন দ্বারা। পরবর্তী বছরগুলোতে সারা ভারতবর্ষে বন-সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। নিছক ব্রিটিশ বাণিজ্য স্বার্থে আহরণের জন্য বনভূমি সংরক্ষণ এবং তার অনুষঙ্গ হিসেবে একটি সাধারণের সম্পদ পণ্যে পরিণত হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে ছিল এ প্রতিবাদ। নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার ঘোষণা করার জন্য গ্রামবাসীরা আনুষ্ঠানিভাবে সংরক্ষিত বনভুমি হত বনজ উৎপাদসমূহ (forest products) সরিয়ে ফেলতো। হিমাচল, পশ্চিম ঘাট, মধ্য ভারতীয় পার্বত্যাঞ্চল প্রভৃতির মতো যেসব এলাকায় স্থানীয় জনগণের বেঁচে থাকার বিষয়টি খুব ঘনিষ্ঠভাবে বনে অভিগম্যতার ওপর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল সেসব এলাকায় বন সত্যাগ্রহ বিশেষভাবে সফল হয়েছিল। এসব অহিংস আন্দোলন ব্রিটিশরা খুব প্রণালীবদ্ধভাবে বিনাশ করেছিল। মধ্য ভারতে গোন্ড (***) আদিবাসীদেরকে গুলি করে মারা হয়েছিল প্রতিবাদে অংশ নেয়ার কারণে। ১৯৩০ সালে তেহরি গারওয়ালে তিলারি গ্রামে কয়েক ডজন নিরস্ত্র গ্রামবাসীকে হত্যা এবং শত শত জনকে আহত করা হয় স্থানীয় শাসকদের বন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হওয়ার কারণে। ব্যাপক প্রাণহানির পর এসব সত্যাগ্রহ সফল

হয়েছিল বনের বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যে গ্রামের জনগণের ঐতিহ্যগত অধিকারের কিছু কিছু পুনঃবলবৎ করতে।

বাণিজ্যিকীকরণ ও সংকোচনবাদের ঔপনিবেশিক পথই উপনিবেশোত্তর ভারতে বন নীতির ক্ষেত্রে অনুসৃত হতে থাকে। প্রতিবেশগত বিপর্যয় আনায়ন আর নিজেদের অধিকারহানির প্রতিবাদে একই সাথে অব্যাহত থাকে মানুষের বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদও। বিখ্যাত চিপকো আন্দোলনে ঘারওয়ালের মহিলারা এমনকি নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েও তাদের বনগুলোকে বাণিজ্যিক শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এলো। হিমালয়ের পার্বত্যাঞ্চলের এসব মহিলারা জীবন্ত গাছগুলোকে আঁকড়ে ধরে, সেগুলোর রক্ষক হিসেবে। ১৯৭০ পরবর্তী দশকের গোড়ায় উত্তর প্রদেশের ঘারওয়াল অঞ্চলে এ আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তীতে চিপকোর দর্শন ও কার্যপদ্ধতি উত্তরের হিমাচল প্রদেশ, দক্ষিণের কর্নাটক, পশ্চিমের রাজস্থান, পূর্বের উড়িশ্যা এবং মধ্য ভারতে উচ্চ ভূমি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

বিশ্বের উষ্ণমণ্ডলীয় বনভূমিতে যেসব শিকারী ও সংগ্রাহক ট্রাইব (বাংলা উপজাতি নয়) এখনও টিকে আছে বোর্নিওর পেনানরা তাদের অন্যতম। বোর্নিও তথা মালয়েশিয়ার সারওয়াক এবং ইন্দোনেশিয়ার কালিমান্তনের বনভূমিতেই তারা শত শত বছর ধরে বসবাস করে আসছে। মাছ এবং শিকারের পাশাপাশি বুনো সাগু হচ্ছে তাদের প্রধান খাদ্য। তাদের সকলই প্রয়োজনই বন থেকে পূরণ হয়। আজ তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে, কারণ যে বন তাদের জীবন দেয় এবং যে বন তাদের দেবতা ও পূর্বপুরুষদের আবাসস্থল তাকে এখন বাণিজ্যিক কাঠ এবং বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের উৎসে পরিণত করা হয়েছে। বিশ্বের প্রায় সব এলাকা থেকে বাণিজ্যিক কাঠের গুঁড়ির ব্যবসায়ীরা এশিয়ার বনভূমির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। বিশ্বব্যাপী উষ্ণমণ্ডলীয় শক্ত-টেকসই কাঠের বাজারের আশি শতাংশ আসে মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে। আর এ দুটো দেশের বনভূমির প্রাণসম্পদের বৈচিত্রের বিষয়টি সহজেই প্রতিফলিত হয় বন নির্ভর মানুষদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের মাঝ দিয়ে। গাছ কাটার এ বিনাশ বর্তমান হারে চলতে থাকলে এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক বনভূমি এক দশকের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যাবে। আর বনভূমির বিনাশ মানে হলো বন কেন্দ্রিক মানুষদের সমূলে ধ্বংস করা।

১৯৮৭ সালের মার্চে এসে কিলাবিত ও কায়ান জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি পেনান জনগোষ্ঠীও ঘুরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় – শান্তিপূর্ণভাবে । কাঠ কোম্পানীগুলো কর্তৃক তাদের বনভূমির আবাস ধ্বংস করা বন্ধ করার জন্য তারা লগিং ট্র্যাকে মানব

প্রতিবন্ধক তৈরি করে। তখন থেকে তারা বাণিজ্যিক কাঠ কর্তনের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

ঐতিহ্যগত অর্থনীতির মুল নীতি হলো বাস্তুসংস্থানগত স্থিতিশীলতাকে বজায় রেখে জীবন-জীবিকার সংস্থান করা। খাদ্য, বাসস্থান ও বস্ত্রের মতো মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনগুলো পূরণের জন্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করার সামর্থ্য শিল্পোন্নত, সমৃদ্ধ অর্থনীতির মতো সনাতন অর্থনীতিরও রয়েছে। কিন্তু অন্তত দু'টি ক্ষেত্রে সনাতন অর্থনীতি শিল্পোন্নত অর্থনীতির তুলনায় আলাদা। প্রথমতঃ, শিল্পায়িত অর্থনীতিতে একই অভাব মেটানোর জন্য দীর্ঘতর প্রযুক্তিগত চেইন অনুসরণ করা হয় এবং তাতে উচ্চতর শক্তি ও সম্পদ কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, বর্জ্য ও দূষণের পরিমাণ হয় অনেক বেশি। অথচ একই সময়ে বিরাট সংখ্যক মানুষই ক্রয় ক্ষমতাহীন এবং জীবিকার্জনের উপায় থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচুর্য ও অতি-উৎপাদন নতুন ও কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করে। এভাবে তৈরি হয় অতি ভোগ, যা প্রাকৃতিক সম্পদের আরও অধিক আহরণকে অত্যাবশ্যক করে তোলে। অপব্যয়ী ভোগবাদের মানদণ্ডে সনাতনী অর্থনীতিগুলো হয়তো 'অগ্রসর' নয়, কিন্তু মৌলিক ও গুরুত্বপুর্ণ অভাবগুলো মেটানোর দিক থেকে এ অর্থনীতিগুলো অনেক সময়ই, মার্শাল শালিনস্ যেমন বলেছেন, 'আদি প্রাচুর্যপূর্ণ সমাজ' হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে। সমৃদ্ধ রেইন ফরেস্টে আমাজনীয় ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর অভাব বেশ ভালোভাবেই তুষ্ট হয়, তাদের দারিদ্র্য শুরু হয় বন ধ্বংসের সাথে সাথে। মালয়েশিয়ার সারওয়াকের পেনান জাতিগোষ্ঠি বা ভারতের বাসতার-এর গোন্ড জাতিগোষ্ঠি – সবার ক্ষেত্রেই গল্পটা একই রকম।

অভিযোজিত ও সংক্ষেপিত : Wolfgang Sachs সম্পাদিত Development Dictionary গ্রন্থের 'Resources' শিরোনামের নিবন্ধ।]